Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 309 – 318
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

যুধিষ্ঠির মাজির উপন্যাসে মানভূম-পুরুলিয়ার নাচনি, রসিক ও ঝুমুরিয়া প্রসঙ্গ : অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, ছাতনা, বাঁকুড়া
Email ID : kumbhakarprasanta@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Nachni, Rasik, Jhumur, jhumuria, Folkdance, Landlord, Jangalmahal, Rasamela.

Abstract
Among all the novels that have been written in Bengali literature focusing on the lives of Manbhum-Purulia's Nachnis, two notable additions are 'Baghmundir Radha' and 'Rajnartaki' wtitten by Youdhistir Maji. In these two novels, he sheds light not only on the Nachnis, but also on the patrons of the Nachnis, various landlords and Rasiks, as well as Nagars and Jhumurias. If we want to know the social position of the Nachnis, their relationship with the Rasiks, the history of their suffering, proverty and despair, we have to turn to these two novels. While sketching the characters of Radha and Bishakha, the two heroines of the two novels, the novelist has penetrated into the essence of the contemporary social and politic al life and presented the reality in the guise of story. This is the great thing about literature. The main purpose of this essay is to explore the real history in context of these two novels.

Discussion
যুধিষ্ঠির মাজি (১৯৩৭–২০২০) পুরুলিয়া জেলার একজন প্রখ্যাত লোক-গবেষক এবং সাহিত্যিক হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনি রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হল গবেষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, ছৌনাচ, নাচনি নাচ এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আজীবন অনুসন্ধান করে গেছেন। এই কারণে প্রবন্ধের মতো তাঁর উপন্যাস এবং গল্পগুলিতেও গবেষণাধর্মী বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে বসবাসকারী লোকশিল্পী ও নাচনিদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাদের সুখ-দুঃখ ও জীবনযন্ত্রনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি 'বাঘমুণ্ডির রাধা' এবং 'রাজনর্তকী'র মতো উপন্যাস। এই দুই উপন্যাসে তৎকালীন জঙ্গলমহলের বহু নাচনি, রসিক ও ঝুমুরিয়া কবির সন্ধান

পাওয়া যায়। উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করে সেইসব লোকশিল্পীদের বাস্তব ইতিহাস অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

এক সময় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা তথা সাবেক মানভূম এবং ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলের একটি অতি জনপ্রিয় লোকনৃত্য ছিল নাচনি নাচ। ঝুমুর গানের সঙ্গে এই নাচনি নাচের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কারণ, ঝুমুর গানের তালে-তালেই এই নাচের বিস্তার। ঝুমুরের ভাব এবং সুরকে ছন্দে, লাস্যে, কটাক্ষে ও মুদ্রায় জীবন্ত করে তুলতেন নাচনিরা। অথচ কালে কালে ঝুমুরের বিকাশ হলেও নাচনিরা আজ সমাজের চোখে ব্রাত্য। নাচনিদের প্রসঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল আজও হয়নি। অনেকেই ভাবেন নাচনিরা মন্দ মেয়ে। নাচনিরাও যে নৃত্যশিল্পী তা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েরাই বাধ্য হয়ে এই ভারতীয় নৃত্যশিল্পের ব্রাত্য শাখায় যোগ দিতেন। এই সব মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে, নাচের তালিম দিয়ে যারা নাচনিতে পরিণত করতেন তাঁরাই ছিলেন রসিক বা নাগর। ফলে নাচনিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিলেন রসিকের ব্যাক্তিগত সম্পত্তি। একজন রসিকের একাধিক নাচনি থাকতো। এই জন্যই নাচনিরা ছিলেন ভদ্রসমাজে উপেক্ষিতা।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন চালু হলে ছোট ছোট জমিদারেরা স্থায়ীভাবে জমিদারিত্ব লাভ করেন। এর ফলশ্রুতিতে মানভূম-পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল এলাকাতেও নতুন নতুন জমিদারির পত্তন হয়েছিল এবং এই দেশীয় জমিদারীগুলিতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনজাতিগোষ্ঠির মানুষেরাই সামন্ত জমিদার হয়ে নিজ নিজ জমিদারী এলাকা তত্ত্বাবধান করতেন।[১] তাঁরা বাদশাহ রাজদরবারের ঠাঁট-বাট সহ 'বাঈজী' নাচের ধারাটিকে আভিজাত্য প্রকাশের জন্য জিঁইয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। তবে এইসব জমিদারেরা যে নৃত্যগীতের সমঝদার এবং পৃষ্টপোষক ছিলেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অনেকেই আবার নিজেই গান রচনা করে গায়কদের দিয়ে গাওয়াতেন। যাইহোক, মোঘল বাদশাহদের মতো 'বাইজী' রাখা তো তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই নিম্নবর্গীয় এবং প্রান্তিক মেয়েদের নাচের জন্য আনা হত। এরাই নাচনি বলে পরিচিত। যতদিন দেহে যৌবন থাকত, ততদিন তাঁদের কদর। বয়সের অন্তিম পর্বে এই নাচনিদের পরিণতি ছিল খুবই ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক। বিশেষ করে রসিক মারা গেলে সেই নাচনির জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। পস্তবালা দেবী নিজের মুখে একথা স্বীকার করেছেন যে, এই সব নাচনিরা মারা গেলে তাঁদের দেহ কেউ সৎকার করত না।[২] গন্ধ ছড়াবে বলে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিত। নাচনির মৃতদেহ শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেত। নাচনি রাজবালা তন্তুবায় এর রসিক খোকা তন্তুবায় মারা গেলে তাঁকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয় এবং কিছুদিন পর উরমা হাটতলায় একটি মহুল গাছের তলায় তিনি মারা যান। কেউ দেহ সৎকারের জন্য আসেনি। তারপর মৃতদেহে পচন শুরু হলে হাটে গন্ধ ছড়াবে বলে কয়েকজন মিলে তাঁর দেহটি দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে ভাগাড়ে ফেলে দেয়।[৩]

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে ঔপন্যাসিক যুধিষ্ঠির মাজি দু'জন নাচনির জীবন-যুদ্ধকে তুলে ধরেছেন। একজন 'বাঘমুণ্ডির রাধা' উপন্যাসের নায়িকা রাধা এবং অন্যজন 'রাজনর্তকী' উপন্যাসের নায়িকা বিশাখা। এই দুই নাচনির জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে মানভূম-পুরুলিয়ার ঝুমুর, নাচনি ও রসিকদের বিবিধ প্রসঙ্গ। 'বাঘমুণ্ডির রাধা' উপন্যাসের প্রথমেই লেখক বাঘমুণ্ডির রাসমেলায় নাচনি নাচের আসরের প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বসেছে রসিক শ্রেষ্ঠ আজমত শেখের নাচনিদের সঙ্গে ঝুমুরিয়া রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির নাচনিদের প্রতিযোগিতার আসর। এই নাচ প্রতিযোগিতার আসরের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিং। নাচের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন দুর্যোধন দাস। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, এই চরিত্রগুলি কিন্তু লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। বাস্তবে এই চরিত্রগুলি বর্তমান ছিলেন। মানভূম-পুরুলিয়ার স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা, অনুশীলন ও উন্নতি বিধানে যেসমস্ত সামন্ত-জমিদার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বাঘমুণ্ডির মদনমোহন সিং তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জানা যায়, তিনি নিজ জমিদারি সেরেস্তার মধ্যে নাচনি এবং রসিকদের বিশেষভাবে সম্মান করে চলতেন।[৪] রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ছিলেন পাতকুম পরগনার অন্তর্গত বীরডি গ্রামের বিখ্যাত ঝুমুর কবি। তিনি একাধারে ঝুমুরের কবি, গায়ক, বাদক, নর্তক ও শিক্ষক ছিলেন।[৫] এছাড়াও তিনি ছিলেন বীরডির 'পাঁচ মৌজার জমিদার' এবং যথার্থ নাচনি রসিক। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি এবং কাঁদড়ার আজমত শেখ ছিলেন

সেইসময়ের প্রবাদপ্রতিম লোকশিল্পী। সে সময় লোকে বলত 'রামকৃষ্ণের গলা আর আজমতের চলার কোনও তুলনাই হয় না।'[৬] আজমত ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। কথিত আছে, তিনি যে গ্রামে নাচতে যেতেন সেই গ্রাম থেকে দু'একজন মেয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে চলে আসত।[৭] দুর্যোধন দাস ছিলেন একাধারে ঝুমুর শিল্পী এবং রসিক। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং দিলীপ কুমার গোস্বামী সম্পাদিত 'মানভূমের ঝুমুর' গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় যে ৭৬ জন ঝুমুর কবির তালিকা আছে, তাতে দুর্যোধন দাসের নাম ও গ্রামের নামপাওয়া যায় ঢুঁড়রি। এছাড়াও যুধিষ্ঠির মাজি মহাশয় তাঁর উপন্যাসে জানিয়েছেন যে, দুর্যোধন দাস বৈষ্ণব সন্তান এবং বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহনের সভাকবি ছিলেন। তাঁদের মতো আরো অনেক জমিদার এবং শিল্পী ঝুমুর গান ও নাচনি নাচকে একটা আলাদা মাত্রায় নিয়ে এসেছিলেন।

যাক, এবার উপন্যাসে ফেরা যাক। বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন ঝুমুর ও নাচনি নাচের বড় ভক্ত এবং প্রতি বছর বাঘমুণ্ডির রাস মেলায় তিনি নাচনি নাচের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে থাকেন। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি তাঁর ষোলজন নাচনিকে নিয়ে বাঘমুণ্ডি এসেছেন। আজমত শেখও পাকা রসিক। নাচের ছন্দ তাঁর রক্তে মিশে আছে। নাচনিদের সঙ্গে তিনি নিজেও নাচেন। এমনকি রাস্তায় চলতে চলতেও তিনি নাচেন।[৮] প্রতিযোগিতার আসরে প্রথমেই তাঁর নাচনিদের ডাকা হল। নাচনিরা গান ধরলেন –

"ফুলেতে বসো না ভ্রমর
ফুলের মধু দিব না।
ষোল বছর বয়সে নাগর,
এ কলঙ্ক নিব না।"

আজমত শেখের নাচনিরা নাচে-গানে আসর জমিয়ে দিলেন। বাঘমুণ্ডির হাজার হাজার দর্শকের হাততালি ও কুলকুলিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। এবার ডাকা হল রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির নাচনিদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁদের কোথাও দেখা গেল না। স্বভাবকবি দুর্যোধন দাস হাসতে হাসতে বললেন- 'গগনে উড়ায়ে ধূলি, পালালেন রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।' রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির মতো বিখ্যাত ঝুমুরিয়া এবং রসিক আজমত শেখের কাছে হারার ভয়ে পালিয়ে যাবেন- একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। হয়তো কাহিনির প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিক এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন।

যাই হোক, এরপর পরিচালক দর্শকবৃন্দদের জানালেন যে, তাঁদের মধ্যে যদি কোনও নাচনি থেকে থাকেন, তাহলে আসরে অবিলম্বে নাগরসহ প্রবেশ করুন। ভালো নাচলে সোনার মেডেল পেতে পারেন নাচনিরা। তখন একজন 'সুগঠিত সুন্দর দেহের অধিকারিণী নারী' আসরে উঠে এসে বললেন তিনি নাচবেন। কিন্তু নাচব বললেই তো আর নাচা যায় না। এখানে নাচনিদের একটা বিশেষ নিয়ম আছে। নাচনিকে ঐ অঞ্চলের মেয়ে হতে হবে।[৮] মেয়েটির রূপ এবং কথাবার্তা শুনে দুর্যোধন দাস বললেন যে, এই মেয়ে বাঘমুণ্ডির মেয়ে হতে পারেন না। এবার মেয়েটি বললেন- 'আমি রাধা। আমি বাঘমুণ্ডির রাধা গ...। আমি নাচতে পারি।' সবাই ভাবলেন আজমত শেখের কাছে হারার গ্লানি সহ্য করতে পারবেন না বলে রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির মতো ঝুমুরিয়া ও রসিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেই পালিয়ে গেলেন, আর এই একরত্তি মেয়ে কি আর করবে। তারপর রাধার আবার নাগরও নেই। যদিও শেষমেশ কুড়ি-বাইশ বছরের একটি যুবক রাধাকে নাচানোর জন্য রসিক সাজলেন। তাঁর নাম রসিক দাস। তাঁর বাবার নাম হরেকৃষ্ণ দাস, এ অঞ্চলের নামকরা কীর্তনীয়া। রসিকের বাজনার তালে তালে নাচতে আরম্ভ করলেন রাধা। সবাই বুঝতে পারলেন রাধা সাধারণ নাচনি নন। বহুবিধ হস্ত প্রচার (হস্তক), নিরীক্ষণ (চোখের কাজ), রসসঞ্চার এবং পদসঞ্চার প্রভৃতিতে উপযুক্ত শিক্ষা তিনি পেয়েছেন। রাধার নাচে মুগ্ধ হল দর্শক। নাচের শেষদিকে বিয়োগান্ত রসের ধারা বইয়ে দিয়ে গান ধরলেন –

"সই ই বড়ো মনের ছিল সাধ,
এ সুখে কাহুর সনে
জনম গোঁয়াবগো-
তাহাতে বিধাতা দিল বাধ।"

রাজকবি দুর্যোধন দাস রাজা মদনমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাধার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। হেরে গেলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আজমত শেখের নাচনিরা।

রাধার এখন তো নিজের বলতে কেউ নেই। তাঁর ভার নেবে কে? রাজকবি বললেন, রাধার দায়িত্ব রসিককেই নিতে হবে। রসিক পড়লেন মহা ফাঁপরে। তিনি পরম বৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ দাসের ছেলে। কোনও দিন নাচনি মেয়েরা তাঁদের বাড়িতে প্রবেশধিকার পান নি। রাধা সুন্দরী, ভদ্র, সুভাষী হলেও নাচনি তো। রসিকের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে রাধা চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু রাজা মদনমোহন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন - 'আমাদের বাঘমুণ্ডি অঞ্চলে নিয়ম আছে যে, কোনও নাগর তার নাচনিকে ছেড়ে দিতে পারবে না। কারণ নাচনিদের নাগরের কাছে কোনও অদেয় থাকে না।'[৯] বাস্তবিক এটাই ছিল নাচনি ও নাগরের সম্পর্ক। রাজাদেশকে অমান্য করার ক্ষমতা রসিকের ছিল না। রাধাকেও তাঁর ভালো লেগেছিল। ফলে রাধা রসিকের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। রসিকের মনোভাব থেকেই বোঝা যায়, সেসময় ভদ্র সমাজে নাচনিদের স্থান কোথায় ছিল।

উপন্যাসের ২য় পরিচ্ছেদে লেখক রাধার জন্ম ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে নাচনিদের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। বহুদিন ধরেই জঙ্গলমহলের সামন্ত রাজা ও ভূমিজ জমিদাররা নাচ ও নাচনির বড়ো ভক্ত ছিলেন। নাচনি নাচ ও ঝুমুর গান এক কালে এই অঞ্চলের রাজঘরানার মাপকাটি হিসেবে বিবেচিত হত। আগে বেনারস, মধ্যপ্রদেশ থেকে মেয়েদের নিয়ে এসে নাচগান উপভোগ করতেন। কালক্রমে এইসব সামন্ত রাজা ও ভূমিজ জমিদারদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে তাঁরা স্থানীয় সুন্দরী অসহায় মেয়েদের ছলে, বলে, কৌশলে ধরে এনে নাচ ও ঝুমুর গান শিখিয়ে নাচনি বানাতে লাগলেন।[১০] সেই সময় বলরাম সিং নামে একজন বেড়াশির সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি তোড়াং অঞ্চলের এক দরিদ্র সুন্দরী গোপ কন্যা চামেলিকে তাঁর পিতার কাছ থেকে মাত্র পাঁচশ টাকায় কিনে নেন। বলরাম সিং নিজে ঝুমুর এবং নাচ জানতেন। তিনি চামেলিকে নাচ-গান শেখাতে লাগলেন। খুব কম সময়েই চামেলি পাকা নাচনিতে রূপান্তরিত হলেন। বলরাম সিং একবার চামেলিকে জামসেদপুরের নাচনি নাচের আসরে নিয়ে যান। জামসেদপুরে তখন নতুন টাটা কোম্পানি গড়ে উঠেছে। সেই টাটা কোম্পানির অফিসার শ্যামল সেন চামেলির রূপ-যৌবন ও নাচ দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে, বেড়াশির ক্ষুদে জমিদার বলরাম সিং-এর কাছ থেকে চামেলিকে সাত হাজার টাকায় কিনে নেন। শ্যামল সেনের বাড়িতে চামেলি এখন কাজের মেয়ে, রক্ষিতা এবং রাত্রে নাচনি। এখানে আসার দেড় বছর পর চামেলি সন্তানসম্ভবা হলেন। তারপর যথারীতি আউট হাউসে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যাই রাধা। ছোটবেলা থেকেই রাধা ভালো নাচতে পারতেন। তাই শ্যামল সেন তাঁকে একটি নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেন। রাধার প্রথমে ধারণা ছিল শ্যামল বাবু তাঁর বাবা। কিন্তু রাধার এই ভুল ভাঙল যেদিন শ্যামল বাবু কলকাতা থেকে বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে টাটা নগরের বাংলোতে এলেন। চামেলির কাছে রাধা তাঁর জন্ম রহস্য জানতে চাইলেন। তাঁর মা জানালেন যে, তিনি 'মন্দ মেয়ে', বাঘমুণ্ডির নাচনি'। একথা জানার পর রাধা তাঁর মায়ের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন বাঘমুণ্ডির পথে।

পথে চাণ্ডিলের জমিদার লালমোহন হাজরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লালমোহন হাজরা বিয়ে করেন নি। তাঁর দুজন নাচনিই ছিল সব। তাঁর বয়স হওয়ায় আর নাচনি নাচাতে পারেন না। ফলে দুই নাচনিই তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছেন। রাধাকে দেখেই লালমোহনের মনে হয় রাধা পাকা নাচনি হতে পারবেন। লালমোহন তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে রাধা বলেন যে, তিনি নাচ-গান জানেন, নাচ-গান শেখানোর কাজ পেলে ভালো হয়। লালমোহনের কাছে রাধাকে থাকার জন্য বলা হলে রাধা 'গায়ে হাত না দেওয়ার শর্তে' থাকতে রাজি হলেন। লালমোহনের বাড়িতে রাধা দুটো বছর ছিলেন। বাড়ির সমস্ত কাজ এবং জমিদারির হিসেব রাখতেন রাধা। ভালোই ছিলেন। কিন্তু একদিন রাত্রিতে হঠাৎ লালমোহন রাধার বিছানায় এসে রাধাকে জড়িয়ে ধরলেন। রাধা এক লাথি মেরে তাঁকে ফেলে দিলেন এবং বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর বাঘমুণ্ডির নাচের আসরে তিনি পেলেন সোনার মেডেল এবং রসিককে।

রসিক বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা জাতের বিচার করেন না। কিন্তু রাধা নাচনি না হয়ে অন্য কিছু হলে রাধাকে বিয়ে করতে রসিকের কোনও বাধা ছিল না। রসিকের মা হরিমতী রাধাকে দেখে আত্মহারা হয়েছেন। রাধা নিজেকে নাচনি

বলে পরিচয় দিলে হরিমতী তা বিশ্বাসই করেন নি। হরেকৃষ্ণ দাস তাঁর স্ত্রীর ভুল ভাঙ্গিয়ে বলেছেন যে, বাঘমুণ্ডির নাচের প্রতিযোগিতায় এই রাধা সোনার মেডেল পেয়েছেন এবং তাঁর ছেলে এখন থেকে রাধার নাগর। রাধাকে তাঁরা কেউই ভালো চোখে দেখেন নি। রসিকের মা বলেছেন –

"নাচনিরা মন্দ মেয়ে। এই মেয়েকে ঘরে রাখা যায় না বাবা। এ পাপ বিদায় করে দে...।"[১১]

অবশেষে রসিকের বাব-মা রাধাকে মেনে নিয়েছেন এই শর্তে যে, রাধা আর কখনও নাচতে পারবেন না। ওদিকে রাজা মদনমোহন রাধাকে নাচের আসরে আমন্ত্রণ জানান। রাজার আদেশ অমান্য করলে বিপদ হতে পারে ভেবে হরেকৃষ্ণ বৃন্দাবনে চলে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু রাধা তাতে রাজি হন নি।

বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহনের রাজসভায় নাচনি নাচের বিরাট প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এসেছেন নৃত্যরসিক নাগর আজমত শেখ, বিখ্যাত ঝুমুরিয়া রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি। এছাড়াও এসেছেন আড়ষা, তোড়াং, সিল্লি, বলরামপুর, বান্দোয়ান প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজা ও নামজাদা নাগরেরা। নাচনি ও রসিকের সমাবেশে যেন 'চাঁদের হাট' বসেছে। সবাই নাচনি রাধার জন্য অপেক্ষা করছেন। দুর্যোধন দাস বলেছেন, 'নাচনি রাধাকে আমরা আনতে পারিনি। রাধা এখন হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্রবধূ'। এই কথা শুনে অনেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, "নাচনি কখনও গৃহবধূ হয় নাকি? কালে কালে কত অনাচার দেখব আমরা?"[১২] অর্থাৎ নাচনিরা কারও স্ত্রী হতে পারবেন না- এই রকমই ছিল সেকালের মানুষের বিশ্বাস। তবে পরবর্তীকালে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক রসিক ও নাচনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। যেমন- আড়ষা থানার কেন্দরী গ্রামের মহেশ্বর মাহাত (চেপা মাহাত) ও সিন্ধুবালা দেবী, মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামের নিবারণ মাহাত ও গীতারানী দেবী, ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত বুণ্ডুর লক্ষ্মীচরণ সিং মুড়া ও বুটন দেবী, পুরুলিয়ার যুগিডি গ্রামের কার্তিক তন্তুবায় ও রাজবালা দেবী, রঘুনন্দন কুমার ও বিমলা দেবী প্রমুখ।[১৩]

উপন্যাসে দেখা যায় রাধা নাচতে না এলে জনসাধারণ রাজা মদনমোহনকে বলেছে যে, এটা রাজার অপমান। রাধাকে ধরে আনার আদেশ দেওয়া হোক। অবশ্য তার প্রয়োজন হয় নি। রাধা নিজেই এই আসরে নাচতে এসেছেন পরিবারকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তাঁর নাগর রসিক দাসকে আনতে পারেন নি। তাই রাধার অনুরোধ দুর্যোধন দাস রসিকের কাজটা করে দেবেন। আজ রাধার প্রতিযোগিতা হবে ঝুমুরিয়া শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির বিখ্যাত নাচনি সুভদ্রার সঙ্গে। নাচনি সুভদ্রাও কিন্তু বাস্তব চরিত্র। জানা যায়, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সুভদ্রা, বিধুমুখী এবং বেলা নামে তিনজন নাচনি ছিলেন এবং ইচাগড় রাজার রাসলীলায় তিনি একুশজন নাচনি নিয়ে ঝুমুরগান পরিবেশন করেছিলেন।[১৪] যাইহোক, এরপর রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি নাগরের পোষাক পরে আসরে নামলেন। তাঁর কাঁধে রয়েছে সুন্দর করে সাজানো ঢোল আর ডান হাতে কাঠি। গণেশ বন্দনা করে ঢোলে কাঠি পড়ল। সুভদ্রা নাচতে নাচতে গান ধরলেন –

"প্রেম সরোবরের জলে পিরীতি কমল দলে
নবীন ভ্রমর রস খায়,
তবু মধু কভু না ফুরায়।
রসিকা রসেতে ভাসে ভ্রমর কমলে বসে
নিরমল রসে ডুবি যায়,
তবু মধু কভু না ফুরায়।"

গানের সুরে আর যৌবনের হিল্লোলে সুভদ্রা আসর মাতিয়ে দিলেন। তাঁর বাঁকা চোখের নাচনে দর্শক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এবার রাধার পালা। ঢোল কাঁধে আসরে নামলেন দুর্যোধন দাস। ঢোলে কাঠি পড়তেই রাধা নাচতে নাচতে গান শুরু করলেন –

"রতি রস সার বিগলিত ভার
গলিত কুসুম দাম মণিময় হার।
আভরণ কিঙ্কিনি নূপুর বোল
রতি জয় রঙ্গিনি গণ উতরোল।"

নাচতে নাচতে রাধার খোঁপা খুলে পড়েছে। এলোচুল থেকে খসে পড়ছে কুসুমদাম। রাধার আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। একসময় রাধার অবশ দেহটাই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অবাক বিস্ময়ে সকলে রাধার নাচ উপভোগ করলেন। রাজা মদনমোহন সোনার মেডেল পরিয়ে দিলেন রাধার গলায়। আজমত শেখের নাচনি মান্যতা নাচার আগেই রাধার কাছে হার মেনে নিলেন। পরের দিন রাধা যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলেন তখন দেখলেন বাড়িতে কেউ নেই। হরেকৃষ্ণ, হরিমতী এবং রসিক একদিকে রাজার ভয়ে, অন্যদিকে সামাজিক সম্মান হানির ভয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছেন। এদিকে রাধার অবৈধ পিতা শ্যামল সেন নতুন স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাধাকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে যান এবং রাধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। রাধার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। কলকাতায় রাধা মনিপুরী নৃত্যের তালিম নিয়ে নিজেকে বিখ্যাত মনিপুরী নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে বেনারসে নৃত্যানুষ্ঠান করতে গিয়ে রাধার রসিকের সঙ্গে আবার দেখা হয় এবং রসিককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির রাধা কীভাবে নাচনি থেকে বিখ্যাত মনিপুরী নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠলেন তারই ইতিহাস এই উপন্যাসটি। এবং এই ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তৎকালীন নাচনি, রসিক তথা নাগর এবং সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থাকে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে 'রাজনর্তকী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যুধিষ্ঠির মাজি ১৯৩৫ সালের প্রেক্ষাপটে জঙ্গলমহলের বিশাখা নামের এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নাচনির সামগ্রিক জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে নাচনি ও রসিক সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রকে অঙ্কন করেছেন। তবে রাধা বা অন্যান্য নাচনিদের সঙ্গে বিশাখার পার্থক্য এই যে, তিনি প্রতিবাদী, বিদ্রোহিণী নারী যিনি নাচনি নাচকে জাতে তুলতে চেয়েছিলেন। পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে তখন নাচনি নাচের সুবর্ণ যুগ। বাঘমুণ্ডি, বেড়াশি, চকাহাতু, চাণ্ডিল, ইচাগড়, তোড়াং, সিল্লি, কাড়িহেঁস, দুলমি প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমিজ রাজারা একাধিক নাচনি রেখে নাচ-গান উপভোগ করতেন।[১৫] এমনি একজন ভূমিজ রাজা হলেন দুলমির বনমালী সিং মানকি। তিনি তরুবালা, বিরলা, বিনতা এবং সুভদ্রা নামে চারজন নাচনির রসিক ছিলেন। এই নাচনিদের কাছে তিনি একাধারে নাগর, শিক্ষাগুরু এবং স্বামী। একদিন তাঁর আমন্ত্রণে চকাহাতুর কৃষ্ণদাস বৈরাগী অষ্টাদশী কন্যা বিশাখা সহ রাজবাড়িতে কীর্তন গাইতে এলেন। বিশাখা গাইলেন পীতাম্বর দাসের একটি ঝুমুর। পীতাম্বর দাস বাঁকুড়ার মানুষ হলেও তাঁর রচিত ও মুদ্রিত ঝুমুর পদসমূহ মানভূমেই অধিক প্রচলিত।[১৬] বিশাখার সুন্দর গান ও ততোধিক সুন্দর চেহারা দেখে তাঁকে নাচনিরূপে পেতে চাইলেন বনমালী সিং। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, অন্যান্য নাচনিদের সঙ্গে রাজার দৈহিক সম্পর্ক থাকলেও বিশাখাকে তিনি মেয়ের মতো দেখতে লাগলেন এবং কথা দিলেন যে, বিশাখাকে তিনি নৃত্যশিল্পী বানাবেন, রক্ষিতা নয়। শুরু হল বিশাখার নাচের ট্রেনিং। একজন নৃত্যশিল্পীর রূপ, গুণ, রসবোধ সবই বিশাখার মধ্যে বর্তমান। টানা তিন বছর নিরলস সাধনার ফলে বিশাখা নৃত্যশিল্পীর সমস্ত কৌশল আয়ত্ত করলেন। ১৯৩৮ সালে বাঘমুণ্ডির রাসের মেলায় বিশাখা রাজনর্তকী রূপে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন। বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহনের রাজবাড়িতে নাচনিদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। রাজসভাকবি দুর্যোধন দাস দর্শকদের সাথে নাগরদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আসরে এসেছেন নাচনিসহ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, আজমত শেখ। এছাড়াও বেড়াশি, চকাহাতু, রাঁচি, সিরকাবাদ, তোড়াং, সিল্লি, সিঁদারি প্রভৃতি স্থানের নাচনি ও রসিকেরা এই আসরে উপস্থিত হয়েছেন। আজমত শেখের নাচনিদের নৃত্যের পর আসরে নামলেন বনমালী ও তাঁর শিক্ষিতা নাচনি বিশাখা। বনমালীর মাথায় রঙিন পাগড়ি ও ময়ূর পাখা। পরনে জরির লম্বা জামা, সিল্কের পায়জামা, পায়ে নাগরা জুতা। বিশাখার পরনে রং-বেরঙের ঘাঘরা, রেশমের চকচকে ব্লাউজ, কানে রূপার কানবালা আর গলায় সোনার চাঁদমালা, খোঁপায় বেলফুল। বর্ণনা দেখেই বোঝা যায় সেকালীন নাচনিদের সাজ-পোশাক কেমন ছিল। গণেশ বন্দনা দিয়ে নৃত্য-গীত শুরু হল। হস্তক, পদ পাতের ছন্দ, দেহভঙ্গিমা, চোখের কটাক্ষ, মুখে মধুর হাসি মিশিয়ে ঝুমুর গান ও নৃত্য পরিবেশন করলেন বিশাখা। ঢোল বাজাতে বাজাতে বনমালীর কাশি ও মুখে রক্ত ওঠা শুরু হল। আসরে উপস্থিত ছিলেন ঝুমুরিয়া কবি ও চিকিৎসক জগৎচন্দ্র কবিরাজ, যিনি মানভূমের লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে একজন প্রখ্যাত লোকশিল্পী।[১৭] তিনি পরীক্ষা করে বললেন যে, রাজা যক্ষ্মায় আক্রান্ত।

পরদিন বনমালী দুর্যোধন দাসের পুত্র মাধব দাসকে সঙ্গে নিয়ে দুলমিতে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে বনমালী টের পেয়েছেন যে, মাধবের সঙ্গে বিশাখার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তাতে তিনি খুশিই হয়েছেন। দিনদিন রাজার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তিনি মারা যাবেন ভেবেই সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিশাখাকে উইল করে দিয়েছেন। চারমাস পর তিনি মারা গেলেন। এখন জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বিশাখা। সর্বসমক্ষে বিশাখা রাজার অন্তিম ইচ্ছার কথা জানালে সবাই চমকে উঠল। রাজনর্তকী তো রাজবেশ্যা। বিশাখা নাচনি হয়ে বিয়ে করবে? কে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হবে? বিশাখা জানালেন যে, রাজা মৃত্যুর আগে মাধব দাসকে তাঁর পাত্র হিসেবে নির্বাচন করে গেছেন। মাধব দাস অবশ্য এ বিয়েতে রাজি। বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন নিজে কন্যাদান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য রাজবাড়ির বাইরে নানারকম অকথা-কুকথা চলতে লাগল। বিয়ের দিন রাজবাড়িতে নাচ-গানের বন্যা বয়ে গেল। মানভূম-পুরুলিয়ার বিখ্যাত সব ঝুমুরিয়া রসিক ও নাচনিরা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। এই ভাবে একজন নাচনির বিয়ে হল যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভাবনীয়।

এই আনন্দের মাঝে একটি শোক সংবাদ আসে। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির মৃত্যু। নাচনি ও ঝুমুর সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। রসিক-ঝুমুরিয়া রামকৃষ্ণের শোকসভাতে বিশাখার সঙ্গে পরিচয় হয় উত্তর মানভূমের প্রবাদপ্রতিম কবি ও ঝুমুরিয়া ভবপ্রীতানন্দ ওঝার। 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জুরী' গ্রন্থে ভবপ্রীতানন্দ নিজের বংশাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসেও যুধিষ্ঠির মাজি ভবপ্রীতানন্দ ও কমলার কিছুটা ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, ভবপ্রীতানন্দ মানভূমের মানুষ নন, মিথিলার। কাশীপুরের মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ সিং দেওয়ের আমলে তিনি কাশীপুরে এসে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে রাজসভাকবির আসন অলংকৃত করেন। কমলা (ঝরিয়া) তাঁর গান গেয়েই ঝুমুর গানকে জাতে তুলেছেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, কমলার জন্ম হয় চাষ চন্দনকিয়ারী অঞ্চলের এক নিম্নবর্ণের দরিদ্র পরিবারে। অল্পবয়স থেকেই তিনি মাঠে ঘাটে গান গেয়ে বেড়াতেন। কোনো একদিন ঝরিয়ার রাজা রাস্তায় যাবার সময় তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন ও তাঁকে রাজবাড়িতে এনে ওস্তাদ রেখে গান ও নাচ শেখান। কমলাও রাজনর্তকী। কিন্তু স্বাধীন এবং রাজা তাঁকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। পরে কমলার সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দের পরিচয় হয়। কমলার ঝুমুর গানের রেকর্ড বার হয় 'হিজ মাস্টার ভয়েস' কোম্পানিতে। পরবর্তীকালে 'আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র' থেকে কমলা শিল্পীর মর্যাদা পান।[১৮] যাইহোক, বিশাখাকে ভবপ্রীতানন্দ খুব স্নেহের চোখে দেখেন। ঝরিয়ার রাজাকে তিনি বিশাখার কথা জানাবেন। বিশাখা যে রাজনর্তকী হয়েও সংসার ধর্ম পালন করছেন-এতে তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

কয়েক বছর পর ঝরিয়ার রাজার আমন্ত্রণ পত্র এসে পৌঁছাল দুলমির রাজবাড়িতে। ঝরিয়ার রাজবাড়িতেই বিখ্যাত ঝুমুরশিল্পী কমলা থাকেন। ঝরিয়া যাওয়ার আগেই গ্রামোফোন থেকে বিশাখা কমলার গান শুনলেন –

"তেপান্তরের মাঠে বঁধূ হে... এক্যা বস্যে থাকি... (২)
জলকে যাতে গেলে কালার চরণ-ধুলা মাখি,
বঁধূ হে এক্যা বস্যে থাকি।"

তারপর একদিন দলবল নিয়ে বিশাখা ঝরিয়ার রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মেয়ে কমলা এসে বিশাখাকে প্রণাম করলেন। রাজা গর্বের সঙ্গে জানালেন, বিশাখা ছাড়া জঙ্গলমহলের নাচনিরা কেউ কোনোদিন গৃহবধূ হতে পারেন নি। তাই বিশাখার কাছে রাজার বিশেষ অনুরোধ, নাচনিদের মন্দ মেয়ে থেকে ভালো মেয়েতে রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই তাঁরা শিল্পীর মর্যাদা পাবেন। কমলার সঙ্গে গল্প করতে করতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ উঠে এল। দ্বিতীয়বার 'হিজ মাস্টার ভয়েস' কোম্পানিতে গানের রেকর্ড করতে গিয়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে কমলার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কমলা জানিয়েছে –

> "আমার গান রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর অফিসে একজন বলল, কাজী নজরুল ইসলাম ডাকছেন। ...আমি অফিসে চলে গেলাম। আমাকে দেখে কবি নজরুল বললেন, তুমি কমলা (ঝরিয়া)?
> - হ্যাঁ, আমার নাম কমলা।

> - তোমার গান আমি শুনেছি। সুদূর ঝরিয়া থেকে এসে কোন মেয়ে এতো মিষ্টি-মধুর গান গাইতে পারে আমার জানা ছিল না। তুমি গান গেয়ে যাও। শুধু ঝরিয়া নয়, সারা বাংলা তোমাকে মনে রাখবে। তুমি মানভূমের গৌরব।"[১৯]

ঝরিয়ার রাজবাড়িতে এসেছেন বিখ্যাত শিল্পীগণ। শুরু হল নাচ-গানের অনুষ্ঠান। গাইলেন কমলা, ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। কৃষ্ণ সেজে বিশাখা তিনজন সখি নিয়ে রাসনৃত্য করলেন। ভবপ্রীতানন্দ আশীর্বাদ করে বললেন, বিশাখা একদিন মানভূমের নৃত্যকলার মান বাড়িয়ে দেবেন।

ঝরিয়ার রাজার কথামতো দুলমিতে ফিরে বিশাখা নাচনি নাচের সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। স্বামী মাধব দাসের সঙ্গে এনিয়ে মতানৈক্য বেঁধে গেল। মাধব যুক্তি সহকারে বোঝাতে চাইলেন, নাচনি সংস্কৃতিটার জন্ম দিয়েছেন ভূমিজ রাজারা, তাই তাঁরাই এর সংস্কার করতে পারবেন। জঙ্গলমহলের নাচনিরা রাজার রক্ষিতা। তাঁদের ইচ্ছা না থাকলে এর পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু বিশাখা তো চুপচাপ বসে থাকার পাত্রী নন। তাঁকে তো কিছু একটা করতেই হবে। এমন সময় বাঘমুণ্ডি থেকে রাসের মেলায় নাচের আমন্ত্রণ এল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশাখাকে যেতে হল। শ্বশুর দুর্যোধন দাসের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ঝরিয়ার কথা উঠল। সেখানে কমলাও তো রাজনর্তকী। কিন্তু রাজা তাঁকে কন্যাস্নেহে রাখেন, একজন যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা দেন। কিন্তু এখানকার ভূমিজ রাজারা তা মানেন না। এখানে নাচনি মানেই ফুর্তি করার সামগ্রী।

শুরু হল বহু নন্দিত ও নিন্দিত নাচনি নাচের আসর। সমবেত রাজা ও দর্শকদের ইচ্ছা বিশাখার নাচ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হোক। কিন্তু বিশাখা নাচবেন না। শ্বশুরমশাই দুর্যোধন দাসের সামনে তিনি নাচবেন কী করে? ফলে ঝুমুরিয়া দীনা তাঁতি তাঁর নাচনিকে নিয়ে আসরে নেচে গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে দিলেন। দীনা তাঁতির পুরো নাম দীননাথ তন্তুবায়। পাতকুম পরগনার চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত সিরূম গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শোনা যায়, ঝালদার ঠাকুরবাড়িতে ৭২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।[২০] বিশাখা অনুষ্ঠানে একটি কীর্তন পরিবেশন করলেন। রাজা মদনমোহন জানতে চাইলেন, বিশাখা আর কোনও দিন নাচবে কিনা। বিশাখা উত্তর দিলেন –

> "নাচব রাজাবাবু, যেদিন নাচনি নাচ বহু নন্দিত হবে, কিন্তু নিন্দিত হবে না। যেদিন নাচনিরা শিল্পীর মর্যাদা পাবে। নাচনিদের জমিদার নাগরগণ তাদের রক্ষিতা করে রাখবে না, যেদিন নাগরগণ নিজেদের নাচনিদের টাকার বিনিময়ে বড়লোক অন্য পুরুষদের হাতে তুলে দেবেন না, যেদিন নাচনিরা আমার মতো বিয়ে করে সংসার করতে পারবে। ছেলেমেয়ের বৈধ মা হতে পারবে, সেদিন এই আসরেই নাচব রাজাবাবু।"

নাচের আসরে থাকা নাগর ও জমিদাররা বিশাখার তীব্র নিন্দা করলেন। এখানকার রাজসংস্কৃতিকে অপমান করার কোন অধিকার বিশাখার নেই। দুর্যোধন দাস তাঁকে ক্ষমা চাইতে বললে তিনি ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন-'আপনারা নাচনিদের রাজবেশ্যা বানিয়ে রাখবেন, আর আমরা মেয়েরা সবকিছু মেনে নেব।' ক্ষমা না চাওয়ায় সমস্ত রাজারা বিশাখার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। বাঘমুণ্ডির নাচের আসরে বিশাখার এই প্রতিবাদ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর স্বামী-শ্বশুর বিশাখার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেন না। বহু রাজা ও জমিদার বিশাখার এই কাজকে অনধিকার চর্চা বলে তীব্র নিন্দা করলেও অনেক পণ্ডিত মানুষ তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঝুমুরিয়া কবি ও চিকিৎসক জগৎচন্দ্র সেনগুপ্ত অন্যতম। তিনি বলেছিলেন, বিশাখার এই সৎ সাহস, নিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা জঙ্গলমহলে যুগান্তর আনতে পারে। জঙ্গলমহলের নাচনিদের যৌবন অতিক্রান্ত হলে ভিক্ষা করেন অথবা না খেয়ে মারা যান। তাঁদের মৃতদেহ দাহ করার লোক থাকে না। বিশাখা সংকল্প করেছেন, এই সমস্ত অত্যাচার থেকে নাচনিদের বাঁচাবেন। কবিরাজকে বিশাখা বললেন- 'আপনি অসহায় নাচনিদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ওদের বাঁচার ব্যবস্থা করব।'

কয়েক দিনের মধ্যে একে একে চল্লিশজন অসহায় নাচনি দুলমির রাজবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা কেউ এসেছেন নাগরের অত্যাচারে, কেউ এসেছেন নাগর মারা যাওয়ার ফলে। তাঁরা নিজেরাই রান্না করেন আর রাত্রিবেলা ঝুমুর ও কীর্তন করেন। ১৯৫৭ সালে বিশাখার হিতাকাঙ্ক্ষী জগৎচন্দ্র কবিরাজ পরলোক গমন করলেন। এদিকে বিশাখা

ঐ চল্লিশজন মেয়েদের নাচের প্রশিক্ষণের জন্য ভগবান দাসকে নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে নাচনি বিরলার সঙ্গে ভগবান দাসের তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। নাচনিদের সামাজিক দাবি প্রতিষ্ঠার এও এক জোরালো পদক্ষেপ।

এই ভাবে দশটা বছর কেটে গেল। বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন মারা গেছেন। বিশাখার শ্বশুর দুর্যোধন দাসও গত হয়েছেন। বিশাখার বয়স এখন আটচল্লিশ। শেষ হয়ে গেল তাঁর নারীজীবন। তিনি মা হতে পারলেন না। একদিন তাঁর স্বামী মাধব দাস তাঁর কাছে ফিরে আসবেন- এই আশায় তিনি বুক বেঁধে আছেন। মাধব দাস অবশ্য তাঁর কাছে এসেছিলেন। সেই সময় মাধব বিশাখার কাছে এলে রাজা মদনমোহন এবং দুর্যোধন দাস বিশাখাকে মেরে ফেলতেন। সেই ভয়ে মাধব ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এতদিন পরে মাধব বিশাখার কাছে এলেন। কিন্তু আজ কী দিয়ে তিনি মাধবকে তুষ্ট করবেন। শেষে মাধবকে জড়িয়ে ধরে গানের সুরে বললেন- 'এতদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইত পরাণ গেলে।'

দিন যায়, দিন আসে। বিশাখার শরীর খারাপ হতে থাকে। এখন প্রতি রাতেই তাঁর জ্বর আসে। রাঁচিতে চিকিৎসা করার ফলে কিছুদিন সুস্থ থাকেন। তারপর চিকিৎসা বন্ধ করলে পুনরায় বিশাখা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবার কাশির সাথে রক্ত উঠতে থাকে। এমন সময় 'আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র' থেকে দু'জন লোক বিশাখার ঝুমুর রেকর্ড করতে এলেন। কমলা ঝরিয়ার কাছে খবর পেয়ে তাঁরা এসেছেন। বিশাখা ঐ অসুস্থ শরীরেই গাইলেন ভবপ্রীতানন্দের একটা গান–

"সমাগত মধুমাস না আইল পীতবাস
চিতে মদন বিকাশ কোকিলস্বরে।
নব ফুলে অলিকুল মাতি গুঞ্জরে।"

এদিকে বিশাখার রোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রোজ মুখ থেকে কাশির সাথে রক্ত বার হয়। এখন তিনি শোয়ার ঘরে একাই থাকেন। মাধব তাঁর কাছে এলেও বেশিক্ষণ থাকেন না। বিশাখা রেডিওতে গান শোনেন। একদিন আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচিতে শোনা যায় যে, ঐদিন রাত সাড়ে আটটায় রাজনর্তকী বিশাখার ঝুমুর গান সম্প্রচার হবে। এই খবর দুলমির সবাই শুনলেন। ঠিক রাত সাড়ে আটটায় বিশাখার গাওয়া ঝুমুর গান রেডিওতে শোনা গেল। গান শুনতে শুনতে বিশাখা সর্বশক্তি দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বললেন– 'তুমি শুনছ কমলা আমার গান। আমার গান রেডিওতে শোনা যাচ্ছে।' বলতে বলতে রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মাধব দাস বিশাখার রক্তাক্ত শরীরটা তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। দুলমির রাজনর্তকী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। রাজ বাড়িতে থাকা নাচনিদের কান্না সারারাত থামল না। বিশাখার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। আশ্রিতা নাচনিদের মাধব দাস তাড়িয়ে দিলেন, হয়তো কোনও অষ্টাদশীর আশায়। উপন্যাসে বিশাখার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হলেও পরবর্তী কালে নাচনিরা তাঁদের সম্মান পেয়েছেন। আমরা জানি, সিন্ধুবালা দেবী এই নাচের একজন বিখ্যাত শিল্পী এবং 'লালন পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়াও পস্তুবালা, বুটন দেবী, মালাবতী, গীতারানী, শিলাবতী প্রভৃতিরাও শিল্পী হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছেন।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'বাঘমুণ্ডির রাধা' এবং 'রাজনর্তকী'- এই দুই উপন্যাসে দু'জন নাচনির সামগ্রিক জীবনের বিবর্তনকে তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক যুধিষ্ঠির মাজি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা তুলনারহিত। মানভূম-পুরুলিয়ার নাচনি, রসিক ও ঝুমুরিয়াকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সংস্কৃতিকে তিনি গল্পের ছলে জীবন্ত করে তুলেছেন। নাচনিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থান, জমিদার তথা রসিক বা নাগর এবং ঝুমুরিয়া সংস্কৃতির বাস্তব ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই শুধু মানভূমই নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'বাঘমুণ্ডির রাধা' এবং 'রাজনর্তকী' উপন্যাস দু'টি অমর সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে।

Reference :

১. মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মানভূমের নাচনি ও রসিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮০
২. মাহাত, নিমাইকৃষ্ণ, গ্রামজীবনের বিভিন্ন সংস্কৃতি, নবনীতা মাহাত কর্তৃক প্রকাশিত, কাশীপুর, পুরুলিয়া, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ৩৫
৩. তদেব, পৃ. ৩৬
৪. মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মানভূমের নাচনি ও রসিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮০
৫. চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ, মানভূমের ঝুমুর, সম্পাদনা দিলীপ কুমার গোস্বামী, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৬৭ - ১৬৮
৬. মাজি, যুধিষ্ঠির, বাঘমুণ্ডির রাধা, নিন্দিত নৃত্যাঙ্গনা, রূপালী, ২০১৬, পৃ. ৪২
৭. মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মানভূমের নাচনি ও রসিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮০
৮. মাজি, যুধিষ্ঠির, বাঘমুণ্ডির রাধা, নিন্দিত নৃত্যাঙ্গনা, রূপালী, ২০১৬, পৃ. ৪২
৯. তদেব, পৃ. ৪৫
১০. তদেব, পৃ. ৪৬
১১. তদেব, পৃ. ৫১
১২. তদেব, পৃ. ৬৪
১৩. মাহাতো, ক্ষীরোদ চন্দ্র, মানভূমের নাচনি ও রসিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮৭
১৪. https://www.kaliokalam.com/নান্দীকারের-নাটক-নাচনি/
১৫. মাজি, যুধিষ্ঠির, রাজনর্তকী, কিংসুক মাজি ও সুস্মিতা মাজি কর্তৃক প্রকাশিত, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ২০১৯, পৃ. ১৬ ১৬. চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ, মানভূমের ঝুমুর, সম্পাদনা- দিলীপ কুমার গোস্বামী, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৪৭ ১৭. তদেব, পৃ. ১৭৫ - ১৭৬
১৮. মাজি, যুধিষ্ঠির, রাজনর্তকী, কিংসুক মাজি ও সুস্মিতা মাজি কর্তৃক প্রকাশিত, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ২০১৯, পৃ. ৪৮
১৯. তদেব, পৃ. ৫৩
২০. চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ, মানভূমের ঝুমুর, সম্পাদনা - দিলীপ কুমার গোস্বামী, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১৪৮, ১৫৩